ক্ষুধার তাড়ণায়

যুথিকা বড়ুয়া

মনুষ্য জন্ম বড়ই দুর্লভ। বহু পূণ্যের ফলে মনুষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করে মানুষ। কথাটা কতটুকু সত্য তা আমার জানা নেই, তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। শুধু তাই নয়, নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ীই এই ভবের সংসারে মানুষ সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ভোগ করে। আবার এমনও আছে, জীবিকার তাগিদে যারা প্রতিদিন কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকে, দুঃখ-দীনতাই যাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। মাথা গোঁজার ছাদ থাকে তো পরনের বস্ত্র থাকে না, দু'বেলা অন্ন জোটে তো বিদ্যার্জনের সামর্থ থাকে না। নামমাত্র বেঁচে থাকে। আবার কেউ কেউ আছে, যারা জন্মলগ্ন থেকেই অপরের উপর নির্ভরশীল, অপরের দান-দক্ষিণায় জীবিকা নির্বাহ করে। ভিক্ষের ঝুলি পেতে রাস্তায় বসে ভিক্ষে করে, পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। আত্মরক্ষা করে শহরের কুখ্যাত অলিতে গলিতে কিংবা রেলষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্মের আন্ডারগ্রাউন্ডে পাখীর বাসার মতো গাছের ছালবাকল আর ছেঁড়া বস্তা ঘেরা ছোট্ট ঘুপচি ঘরের ভিতর। যেখানে সামান্য বর্ষণে রাজ্যের কীট-পতঙ্গ, মশা-মাছি, পোকা-মাকড়, বিষধর সাপ, কেঁচো-ব্যাঙ বাসা বাঁধে। আবার কারো কারো সেটুকুও জোটে না। দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী পোহায় উন্মুক্ত নীল সামীয়ানার নীচে। যাদের আমরা ভিক্ষারী বলি। যারা আজও আমাদের সভ্য সমাজে অতি নগণ্য, অশৌচী এবং নিচু স্তরের মানুষ। যাদের স্পর্শ করতে আমরা ঘৃণা করি, অবজ্ঞা করি, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। যাদের সংস্পর্শ থেকে আমরা সর্বদা দূরে সড়ে থাকি। এহেন নিঃসম্বল, আশ্রয়হীন হতদারিদ্র্য ও অভুক্ত মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশেই সবচে' বেশী। যারা একই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেও দেশের নাগরিক হিসেবে কখনো বিবেচিত হয় না। অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখি না যে, একমাত্র আর্থিক অভাবে ওরা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত এবং নিপীড়িত। যার ফলে ওরা ভাষা জানে না, ব্যবহার জানে না, সভ্য মানুষের মতো শান্তি, সুষ্ঠ ও সুশৃংখলভাবে জীবনকে পরিচালনা করতে জানে না। সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালোবাসার মূল্যবোধের অভাবে নিজেদের অস্তিত্বই এরা জাহির করতে পারে না। ভাগ্য বিড়ম্বণায় ক্রমান্বয়ে দুঃখের দহনে ওদের অন্তর থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকচেতনা, মূল্যবোধ, মান-অভিমান বোধ শক্তি। এদের দেহ আছে, আবেগ-অনুভূতি নেই। প্রাণ আছে, হৃদয় নেই। কৃতদাসের মতো ধিক্কার, তিরস্কার, লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই যাদের প্রতিদিনকার খোরাক। তাতেও বোধহয় তৃপ্তি হয় না। অবলীলায় নিজের প্রাণটাই নির্বিকারে দিয়ে দেয় বিসর্জন। যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েও আমরা অপারগ, উপেক্ষা করে চলি। প্রতিবাদ করতেও আমরা কুন্ঠিতবোধ করি।

আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, ঘটনাটি ঘটেছিল, ১৯৯১ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ। সেদিন সকাল থেকেই গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ভাপসা গরম। স্যাঁতসেতে গন্ধ। দম বন্ধ হবার যোগার। তন্মধ্যে ধূঁয়োর মতো আবছা কূয়াশায় ছেয়ে গেছে চারদিক। বেলা দশটা বাজতেই নেমে আসে অন্ধকার। যাচ্ছিলাম চাকুরীর ইন্টারভিউ দিতে। রাশ আওয়ার। যাত্রীর হুড়োহুড়ি। গাড়ির প্রচন্ড ভীড়। নির্ধারিত সময়ে পৌছোতে না পারলেই করে দেবে ডিস্‌কোয়ালিফাই। যাবে চাকুরির বারোটা বেজে।
এইভেবে একটা টেক্সি নিয়ে দ্রুত রওনা হয়ে গেলাম। পৌছেও গিয়েছিলাম প্রায়। কিন্তু বিধিই বাম। গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে চলন্ত টেক্সিটা হঠাৎ বিকট শব্দে থেমে গেল। আমি চমকে উঠি। দেখলাম, সামনে ট্রাফিক জ্যাম্‌। অনবরত হর্ণ বাজজে। পাশেই রোডের গা-ঘেষে নদীর মতো বয়ে গেছে বিরাট একটি খাল। রাজ্যের নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। খালের সংলগ্নে এঁটেল মাটির মতো ঘন কর্দমাক্ত বিশাল চড়। গাড়ী ঘোরাবার বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। পড়ে গেলাম বিপাকে। কি করি!

ভাবতে ভাবতে মুহূর্তের মধ্যে চুতর্দিক থেকে লোকজন ছুটে এসে ভীড় জমে গেল। গলা টেনে দেখি, সে এক অবাক কান্ড। ন্যাতার মতো ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গি পড়া একুশ-বাইশ বছরের একটি তরুণ যুবক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। দেখে মনে হচ্ছিল, মাঝবয়সি লোক। অকালে বাদ্ধর্ক্যে ঢলে পড়েছে। জরা-জীর্ণের মতো রুগ্ন, বস্ত্রহীন শরীর। শরীরের হাঁড্ডিগুলি যেন শুধু চামড়া দিয়ে মোড়া। ঠেলে বেরিয়ে আসছে বাইরে। একদম কঙ্কালের মতো চেহারা। ওকে চার-পাঁচজন এলোপাথাড়ি পিটাচ্ছে। বৃষ্টির ফোটার মতো অনবরত পড়ছে, কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পর আর লাথি। একজনের হাতে ছিল লম্বা একখানা বাঁশের ফালি, সেও দেখি ধোবিখানার কাপড় পেটানোর মতো বাঁশ দিয়ে ইচ্ছে মতো পিঠাচ্ছে।

ততক্ষণে যুবকটির মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে এসেছে। তার কিছুক্ষণ পর ফিনকি দিয়ে গলগল করে ঝড়তে লাগল রক্তের স্রোত। একজন অসহায় দুর্বল মানুষকে এতগুলি লোক একসাথে অবিশ্রান্ত প্রহার করলে কি থাকে তার শরীরে। তাকে অর্ধমৃতই বলা যায়। বেচারা প্রচন্ড আঘাতে যন্ত্রণায় ডানাকাটা পাখীর মতো ছটফট করতে করতে নিস্তেজ শরীরটা তার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে বাজপাখীর মতো ওর গলাটা চিপে ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ওরা ওকে টেনে নিয়ে গেল খালের ধারে। আবর্জনার মতো ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো নোংরা কর্দমাক্ত গভীর চড়ে।

কি হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য। যা ভাষায় বয়ান করা যায় না। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম বিস্ময়ে। এরা কি মানুষ না জানোয়ার! বন্যপশুর মতোই এদের পৈশাচিক আচার, আচরণ! এদের এতটুকু দয়া-মায়াও কি নেই শরীরে!

দৃশ্যটি প্রবল রেখাপাত করলো আমার মুমূর্ষু অন্তরে। আমি বিমূঢ় হয়ে পড়ি। ক্ষোভে দুঃখে গহীন বেদনায় ভীষণভাবে মর্মাহত হলাম এইভেবে যে, এতবড় শহর, কেঁচোর মতো চুতর্দিকে কিল বিল করছে মানুষ। দিনে দূপুরে এই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মতো এমন অমানবিকভাবে পিটালো, আঘাত করলো, অথচ কারো বিবেকে এতটুকু দংশণ করলো না! প্রতিবাদই করলো না কেউ! এতগুলি মানুষ নীরব নির্বিকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখলো সবাই!

তার কারণ, ওরা পথের ভিক্ষারী। যাদের পড়নে বস্তাপঁচা ছেঁড়া ফাটা ময়লা দুর্গন্ধ জামাকাপড়। কাকের বাসার মতো রুক্ষশুস্ক এলোমেলো চুল। কাঙ্গাল লম্পটের মতো চেহারা। যারা ঠিকানাহীন, আশ্রয়হীন, স্বজনহীন, সম্বলহীন, যারা নালা-নর্দমার সংলগ্ন অশুচী নোংরা ঘৃণ্য জগতের বাসিন্দা। আহত যুবকটিও ওদের দলেরই একজন সদস্য। পড়ে থাকে ফুটপাতে। কিংবা যেদিন যেখানে আশ্রয় মেলে সেখানেই রাত কাটায়। দীর্ঘদিন অনাহারে অনিদ্রায় অসুস্থ্য শরীর নিয়ে আহত পাখীর মতো পড়েছিল গাছ তলায়।

কে নেবে এদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার? কে করবে এদের কেচ্ছা-কাহিনীর বিচার? কেইবা দেবে সাহারা? ওরাও কারো অপেক্ষার ধার ধারে না। নিজেরাই বিচারক সেজে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের মতো গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে। প্রতিশোধ নেয়। মরলো কি বাঁচলো, সেদিকে আর হোঁসই থাকে না। অথচ যুবকটির অপরাধ মারাত্মক কিছুই নয়, ওরই জাতভাই আরেক ভিক্ষারীর ঘর, যার কাকের বাসার মতো খড়ের ছাউনি, শলাকাঠির দেওয়াল। জোরে হ্যাচ্চো দিলে মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়বে, এমনিই একটি ঘর থেকে কয়েক দিনের বাশি শুকনো একখানা রুটি চুরির দায়ে যুবকটির ঐ নিমর্ম পরিণতি।

হয়তো তার কিছুক্ষণ পর আহত যুবকটির প্রাণটাই বোধহয় নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে। যার মৃত্যুই ছিল অনিবার্য পরিণতি। যাকে শনাক্ত করার মতোও ভাই-বন্ধু-স্বজন তিনকূলে কেউই ছিল না। যার মৃত্যুতে একফোঁটা চোখের জল কেউ কোনদিনও ফেলবে না। মনেও রাখবে না কেউ কোনদিন। হয়তো ঐ চড়ের কাদামাটিতেই পঁচে গলে ঝরে যাবে যুবকটির মৃতদেহ। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে যাবে মাটির সঙ্গে। ও' সেখানেই হয়ে যাবে সলীল সমাধী। আর আমার মতো যারা ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তাদের প্রত্যেকেরই স্মৃতিপটে জলছবির মতো চিরতরে গেঁথে থাকবে, জীবনে চলার পথে সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের একখন্ড বেদনাময় স্মৃতি।

মহান স্রষ্টার কাছে করজোড়ে শুধু প্রার্থণা করি,-"হে ঈশ্বর, হে বিধাতা, যদি কাউকে মানুষ করেই দু'দিনের এই ভরের সংসারে পাঠাও, তবে তাকে মানুষের মতোই বাঁচতে দিও! অন্তত নিজের বাসস্থানে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে পড়ে সে যেন বেঁচে থাকতে পারে এই সুন্দর পৃথিবীতে!"

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
jbarua1126@gmail.com